শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যবিত্ত ভাবনা

শেখ আবেদ আলি

আমরা এখন যে সমাজ-পরিবেশে লালিত হচ্ছি তা নানা অভিঘাতে আহত; তবে চলিষ্ণু। অতি গণতান্ত্রীকরণ, অপরিসীম ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য, আত্মসুখচরিতার্থতার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, লঘুশ্রমে গুরুপ্রাপ্তি, দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতা...এই পরিমণ্ডলেই চলছে প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা— সব কিছুই। এদের সবগুলোকে নিয়ে বিশ্লেষণ করবার মতো ধৃষ্টতা বা যোগ্যতা কোনটাই নেই। আর সেই মহাভারতের ভার সায়কের ক্ষুদ্র অঙ্গন সইতেও পারবে না। তাই দীর্ঘকাল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটা বিনিময় করতে চাই।

এই জেনারেশনের মুঠোয় মুঠোয় অপব্যবহারের মোবাইল, ঘরে ঘরে টেলিভিশনের দাপাদাপি, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দুরন্ত অর্থতৃষ্ণা, উচ্ছৃঙ্খল-অবক্ষয়িষ্ণু জনমানস— এগুলির মোলায়েম প্রলেপে ঋদ্ধ হয়ে আমাদের কিশোর-কিশোরীরা বই হাতে পড়তে বসে। পাশের ঘরে চলছে দূরদর্শনের সিরিয়াল, সিনেমা, ক্রিকেটের ছক্কা-চৌকা। হাজারে চ্যানেলের আগ্রাসী বিনোদনের নানান উপচার।

পটল—দেখে যা আবার একটা ছক্কা আয় রিমলি— দেখে যা বুড়িকে কেমন দিচ্ছে। ও বড় বৌ — দ্যাখো যে, মেজবৌকে ঝ্যাঁটা দিচ্ছে। পাশের ঘরে পড়ুয়ারা তখন চুলোচুলি করছে, কারো চোখ ঘুমে ঢুলুঢুল। পরিশ্রান্ত ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষি, মুটে-মজুর, ফেরিওয়ালা, রিকশওয়ালা অভিভাবকের গিন্নির প্রতি আবেদন — গইগো, ভাত বাড়ো। আর পারছি না, বোরে আবার ছুটতে হবে।

আমাদের বাড়ি পটলা-রিমলিরা সকাল সকাল জিনার সেরে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হলে কোচিং-এ যায়। হৈ-হল্লা আড্ডার মজাটা বেশ ভালো লাগে। স্কুল কামাই করা, দেরিতে স্কুলে আসা, স্কুল পালানো— সবকিছু করা যায় ঐ হৈ-হল্লার মজাটা পেলে। সেখানে বাঁধন অনেকটা আলগা। বাড়ি ঘুরে কেউ খেয়ে, কেউ অভুক্ত হয়েই স্কুলে আসে। ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ক্লাসে বসে থাকে। আশিজন ছাত্রছাত্রীতেএকটি ইউনিট। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। মামলা-মোকদ্দমায় অনেক পদে নিয়োগ বন্ধ। কারো না কারো নৈমিত্তিক ছুটি। কারো বা মেডিকেল লিভ। কারো ট্রেনিং, কারে মিটিং।

এবার মাস্টারমশাইরা-দিদিমণিরা ক্লাসে এলেন। চল্লিশ মিনিট ধরে পড়ান। রাত্রে বাড়ির লোকের সংলাপ, সকালের কোচিংয়ের হৈ-হুল্লোড়, যাতায়াতের পথে পুকুরে ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া, মৌমাছি-বোলতার চাকে ঢিল মারা, আম-পেয়ারা-লেবু-মটরশুঁটি-মুলো চুরি করে খাওয়া — এসবের বুননে ওদের মাথা ঠাসা। আর মগজে আছে বয়ঃসন্ধিকালের নানান আঁকিবুকি। মাস্টারমশাই কয়েকজনকে হোমটাস্ক ধরে, নতুন পড়া বোঝান। স্টপেজ দিলে চলবে কি করে? সামনেই না ইউনিট টেস্ট। পরীক্ষা নেওয়া হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হত। মূল্যায়িত উত্তরপত্রের খুঁটিনাটি দেখার জন্য অভিভাবকদের অভাবনীয় সুযেগা দেওয়া হয়। অধিকাংশ অভিভাবক উত্তরপত্র দেখার দুঃসাহস না দেখিয়ে প্রাইভেট টিউটরকে রেফার করেন। অভিভাবক আসল-নকল সই হয়ে খাতা ফিরে আসে স্কুলে।

অভিভাবকসভা ডাকা হয়। আলোচনার মজবুত এই প্লাটফর্মে অনেক অভিভাবক গরহাজির। মত বিনিময় হয় না। অথচ স্কুল কমিটির নির্বাচনে অভিভাবকদের ভোটদানের হার আশি/নব্বই শতাংশ। বৎসরান্তে ফল প্রকাশ। অনেকেই অকৃতকার্য। এখন দেখা মেলে অভিভাবকদের। পাশ করানোর জন্য কাকুতি-মিনতি। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে স্কুলের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা প্রায় কুড়ি শতাংশ (সর্বসাকুল্যে) অনুত্তীর্ণ। তার বেলায় অভিভাবকরা নীরব। আমরা থাকি মাটির কাছাকাছি; তাই যত দোষ নন্দ ঘোষ।প্রতিযোগিতার দৌড়ে গ্রামের এইসব অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আকাশচুম্বি স্বপ্ন দেখেন। স্বাভাবিক। বিশ্বায়নের সুফল।

বিদ্যালয় পরিমন্ডলে শাস্তি নিষিদ্ধ। যৎপরোনাস্তি অভব্যতা করলেও ন্যায়ালয়ের ফরমান। অথচ এই ফরমানদাতাদের বড় আদরের সন্তান - সন্ততিরা এইসব গ্রাম্য, অনামী শিক্ষাকেদ্রে পড়ে না। না। বিদ্যালয় যেহেতু বৃহৎ সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তাই সামাজিক মানুষের মতোই সংশোধনমূলক শাস্তি ও পুরস্কার দুটোই থাকা দরকার। ছাত্রছাত্রীরা অভব্যতার চূড়ায় পৌঁছলে কতিপয় অসহিষ্ণু শিক্ষক শাস্তি দেন। তাই নিয়ে চ্যানেলের কভারেজ, সংবাদপত্রের ফুটেজ বিক্রি করে বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের অবাঞ্ছিত আচরণ, শিক্ষককে অবমাননা, মানসিক নির্যাতন নিয়ে তাদের সক্রিয়তা চোখে পড়ে না।

আমাদের প্রত্যাশা যে অনেক। প্রাপ্তি কিন্তু যৎসামান্য। বাস্তবতার নিরিখে তা সঙ্গতিপূর্ণ। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সাফল্যলাভের পিছনে যেসব বাস্তব উপাদানগুলো কাজ করে তা হল —১. বংশগতি, ২. বুদ্ধ্যাঙ্ক, ৩. গৃহপরিবেশ, ৪. সমাজপরিবেশ, ৫. অনুশীলন, ৬. সচেতনতা, ক্ষ. বিদ্যালয় পরিমন্ডল...। প্রাপ্তিযোগ কাঙ্ক্ষিত না হলে বাস্তবতার অন্যান্য উপাদানগুলিকে পরিহার করে শুধুমাত্র বিদ্যালয়কে দায়ী করা হয়। তাই শিক্ষা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তারা বাস্তবানুগ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করলে গেঁয়ো কুঁড়িগুলোও শতদলে বিকশিত হতে পারবে।